কালের কণ্ঠ

তারিখ 22 DEC 2017
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৩

প্রশ্নপত্র ফাঁস জাতির গলায় ফাঁস

সেলাই করা খোলা মুখ

মোফাজ্জল করিম

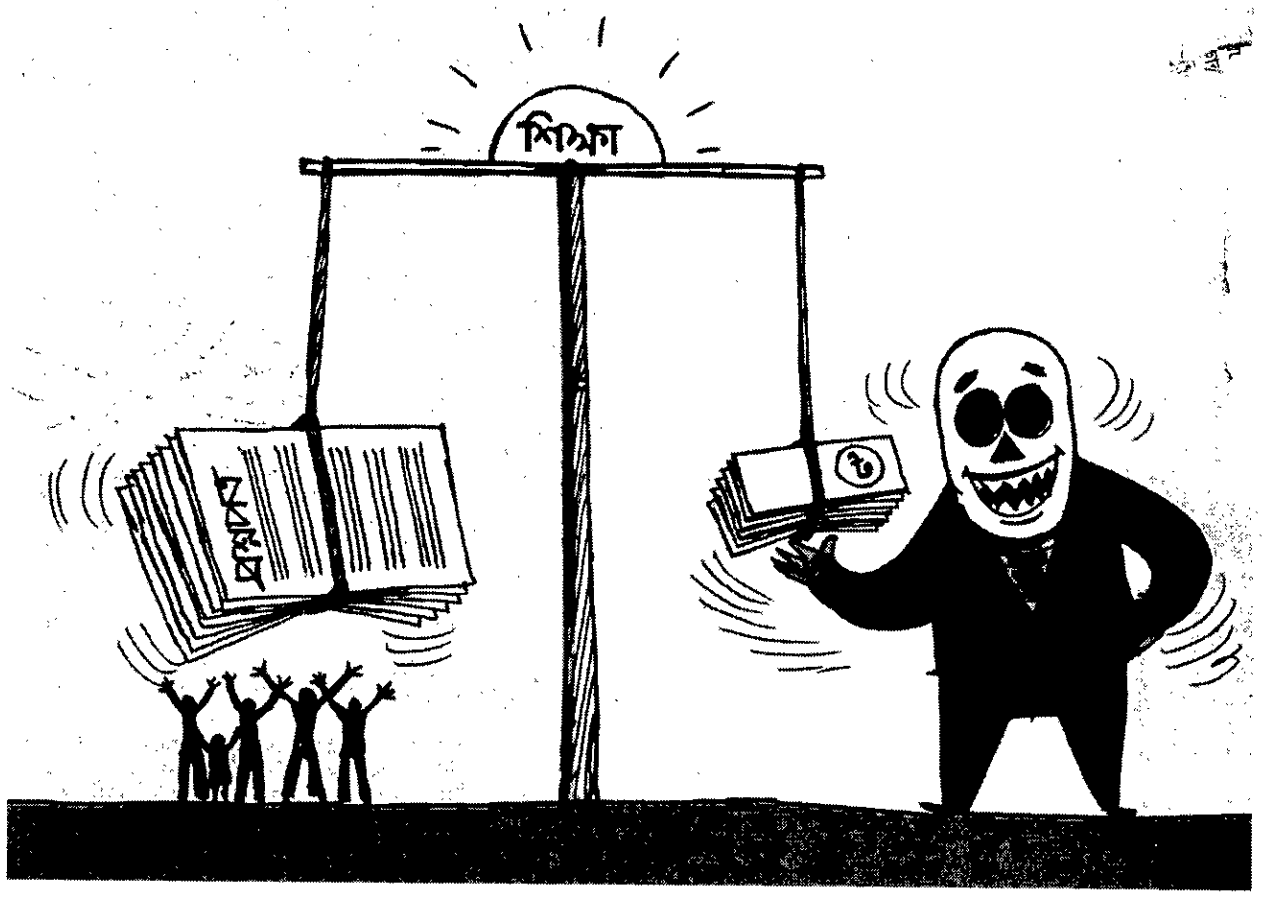

মাঝে মাঝে খবর বেরোয়—ফাঁসকারী চক্রের লোকজন ধরা পড়েছে। যেমনটি ঘটেছে উপরোক্ত সরকারি কর্মকর্তার বেলায়। তারপর আর কিছু শোনা যায় না। এসব ক্ষেত্রে দ্রুত বিচার সম্পন্ন করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত। যেনতেন প্রকারেণ তথাকথিত ভালো ফল পাওয়া ঝুড়ি ঝুড়ি মাকাল ফল দেশের কোনো কাজে আসবে না, বরং দেশকে ডোবাবে, এই বোধটা সকলের ভেতর থাকা দরকার। আর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারটা যে অচিরেই জাতির গলায় ফাঁস হয়ে আটকে গিয়ে জাতিকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারবে, এটা মেনে নিয়ে বিষয়টি এখনই সর্বোচ্চ গুরুত্বসহকারে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা উচিত। তা না হলে পরে পস্তাবারও সময় পাওয়া যাবে না

আমাদের ছেলেবেলায়—সে আজ ৬০/৬৫ বছর আগের কথা—স্কুলে একটা মজার বিতর্ক প্রতিযোগিতা হতো। বিষয় : বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ। এ নিয়ে কখনো-সখনো পরীক্ষায় রচনাও লিখতে হতো। আজ এত যুগ পরে এটা আর বিতর্কের বিষয় নয়। বিজ্ঞান যে আমাদের জীবনে বিরাট আশীর্বাদ, তা তর্ক করে প্রমাণ করতে হয় না।

কিন্তু অবিমিশ্র সুখ বলে যেমন কিছু নেই, তেমনি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াবিহীন নির্ভেজাল আশীর্বাদও কেবল কল্পনায়ই বিরাজ করে। এর একটু-আধটু ক্ষতিকর দিক যে থাকবে না, সেই গ্যারান্টি বোধ হয় কারো পক্ষেই দেওয়া সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুফল পেতে পেতে মানবসভ্যতা এখন উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়েছে এ কথা যেমন সত্য, তেমনি এর নানাবিধ কুফলও হরহামেশাই ভোগ করছে মানুষ। পরিবেশ বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ ঘটিয়ে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী ও আবিষ্কার। এসব আবিষ্কারের ফলে জীবন আগের চেয়ে অনেক সহজ, সুন্দর ও গতিময় হয়েছে ও হচ্ছে সন্দেহ নেই। আবার অনেক ক্ষেত্রে এসবের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে খেসারতও দিতে হচ্ছে বিশাল রকমের।

দুই.

সম্প্রতি এমনই একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা। পৃথিবীর সব দেশই এখন কমবেশি উন্নতি লাভ করেছে আইসিটি বা ইনফরমেশন কম্যুনিকেশন টেকনোলজিতে। এর কল্যাণে সারা বিশ্ব আজ মানুষের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। বাংলাদেশের অজপাড়া-গাঁর অশিক্ষিত পল্লীবধূও আজ মুহূর্তে পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে প্রিয়জনের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদান করতে পারছেন। এটা এমন এক প্রযুক্তি, যা শিখতে খুব একটা বিদ্বান হতে হয় না।

আর সেই সুযোগটা নিয়ে এক শ্রেণির অসাধু মানুষ মেতে উঠেছে জাতির শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের মরণখেলায়। যে প্রযুক্তি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম উন্নয়নের সব ক্ষেত্রে, সেটাই এদের হাতে পড়ে হয়ে গেছে একটি মারণাস্ত্র। এরা এর অপপ্রয়োগ করে ধ্বংস করছে দেশের পরীক্ষাব্যবস্থা। এখন পত্রপত্রিকা খুললেই দেখা যায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ভয়াবহ সব ঘটনা। আর তা শুধু পাবলিক পরীক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিক্যাল কলেজের নির্বাচনী পরীক্ষা বা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাই নয়, এখন তার ডালপালা বিস্তৃত হতে হতে প্রাইমারি স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার মত অতি সাধারণ পরীক্ষা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। পত্রিকায় পড়লাম, বরগুনা জেলার বরগুনা সদর ও বেতাগী উপজেলায় এমন কাণ্ড ঘটেছে। আর রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলায় প্রাইমারি পরীক্ষাকেন্দ্রের বিকেলের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সকালেই পৌঁছে যায় পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের হাতে। নাটোরেও ঘটেছে অনুরূপ ঘটনা। ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট এলাকার শত শত স্কুলের পরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেছে। ভাবা যায়, পরিস্থিতি কত ভয়াবহ হলে এরূপ হতে পারে। এখন পরীক্ষার আগে প্রস্তুতি মানে আদাজল খেয়ে দিনরাত পড়াশোনা নয়, প্রস্তুতি এখন ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র জোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া। আর সেই ইঁদুর দৌড়ে পরীক্ষার্থী ও তার অভিভাবক উভয়েই শরিক হচ্ছেন। এভাবে লেখাপড়া শিকেয় উঠছে, আর মাধ্যমে রেজাল্ট ভাল করার ধুম পড়ে যাচ্ছে।

পরীক্ষায় দুর্নীতি কমবেশি সব কালেই ছিল। তবে আগে ছিল তা বই দেখে লেখা, বইয়ের কাটা পাতা দেখে লেখা, ছোট কাগজের টুকরোয় লিখে নিয়ে আসা উত্তর কপি করা কিংবা অন্য কোনো সহপরীক্ষার্থীর খাতা দেখে লেখা। তখন নকলের জগতে কতকগুলো বিশেষ বিশেষ শব্দও প্রচলিত ছিল। যেমন : যে ছোট্ট চিরকুটে অতি ক্ষুদ্র মিহিদানা অক্ষরে যত্ন সহকারে উত্তর লিখে আনা হতো, তার একটা বহুল প্রচলিত নাম ছিল 'চোথা'। আবার অন্যের উত্তরপত্র, বই বা বইয়ের ছেঁড়া অংশ দেখে লেখার কাজকে বলা হতো 'টুকলিফাই'। ব্যাপক হারে পরীক্ষার হলে নকল করাকে বলা হতো 'গণটোকাটুকি'। এখন প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের কারণে পুরনো সব পদ্ধতি বাসি হয়ে গেছে। এখন মুঠোফোন একাই এক শ। প্রশ্নপত্রের ছবি তোলা, ফোনে উত্তর বলে দেওয়া, অথবা মেসেজ আকারে তা জানিয়ে দেওয়া ইত্যাদি তাবৎ কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম মুঠোফোন নামক এই বিস্ময়যন্ত্র। আর এই যন্ত্রটি বা অস্ত্রটির পেছনের 'ম্যান বিহাইন্ড দ্য গান'-রা হচ্ছে আসল বীরপুরুষ। তারা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের মত দুর্লভ একটা জিনিস আবিষ্কার করেছে বাংলাদেশে, যার ফলে সারা বছর, এমনকি পরীক্ষার আগের রাত্রেও, বইয়ের ধারে-কাছে না গিয়ে পরীক্ষায় ফাটাফাটি রেজাল্ট করছে শিক্ষার্থীরা।

'পরীক্ষার আগের রাত্রে' কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল আগে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা বা মাধ্যমিক পর্যায়ের শেষ পরীক্ষায় (ম্যাট্রিক) কখনো কখনো একটা রচনা লিখতে দেওয়া হতো। এর শিরোনাম ছিল : পরীক্ষার পূর্বরাত্রি। একজন পরীক্ষার্থীর জন্য সেই রাত্রিটি যে কী বিভীষিকাময় ছিল, তারই বর্ণনা থাকত ওই রচনায়। এটা মুখস্থ করছে, ওটাতে চোখ বুলাচ্ছে, এই অঙ্কটা কষে দেখছে, তো ওই জ্যামিতির ছবি আঁকছে পরীক্ষার্থীটি নিমগ্ন সাধনায়। সমস্ত বাড়ি, পাড়া-প্রতিবেশী সবাই ঘুমে অচেতন, শুধু জেগে আছে পরীক্ষার্থী ছেলেটি বা মেয়েটি। আর জেগে আছেন তার স্নেহময়ী মা। তিনি ক্ষণে ক্ষণে পরীক্ষার্থী সন্তানকে তাড়া দিচ্ছেন শুতে যেতে। 'সারা রাত জেগে থাকলে কাল পরীক্ষার হলে বসে লিখবে কী করে? যাও, এখন ঘুমিয়ে পড়ো'—এভাবে তাড়া দিতেন, আর সন্তানের চাহিদামত মাঝে মাঝে চা বানিয়ে দিতেন। কখনো এক গ্লাস দুধ নিয়ে এসে পীড়াপীড়ি করতেন ওটা খেয়ে নিতে। আর এখন? এখন ছেলেটি বা মেয়েটি ব্যস্ত ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র জোগাড়ে। সে রাত জেগে সারাক্ষণ হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে মুঠোফোনে। ফেসবুক-ইন্টারনেট ইত্যাদি ঘাঁটছে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে : কী রে, জানা গেল কিছু? কোচিং ক্লাসের কোনো কোনো শিক্ষককেও ফোনে ধাওয়া করছে সারা রাত। তার বাবা-মাও যথাসাধ্য দৌড়ঝাঁপ করছেন প্রশ্নপত্র নামক সোনার হরিণ ধরতে। তারপর একসময় 'ইউরেকা' বলে চিৎকার দিয়ে উঠছে পরীক্ষার্থীটি। শাওয়াল মাসের চাঁদের মত উদয় হয়েছে প্রশ্নপত্র। কখনো তা শেষ মুহূর্তে, পরীক্ষা শুরু হওয়ার আধা ঘণ্টা-এক ঘণ্টা আগে। মূল্য কত? দশ-বিশ হাজার টাকা। ওটা কিছু না। পরীক্ষায় ভালো ফল করে 'মানুষ' হওয়াটাই বড় কথা! তারপর শুরু হলো দৌড়াদৌড়ি, ছোটাছুটি। স্যারদের কাছ থেকে অতি দ্রুত উত্তর জেনে নিয়ে সন্তর্পণে সেগুলোসহ সবখানে একটা দারুণ 'টিম ওয়ার্ক' লক্ষণীয়। এতে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সবাই হাতে হাত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় নিয়োজিত। সবার উদ্দেশ্যই মহৎ : ছেলে বা মেয়েটিকে ভাল ফল পাইয়ে দিয়ে দেশের একজন সুনাগরিক হতে সাহায্য করা!

মোটামুটি একই চিত্র এখন বাংলাদেশের অন্য সব পরীক্ষার বেলায়ও। তা সে বিসিএস পরীক্ষাই হোক আর কোনো সরকারি-আধা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে লোক নিয়োগের পরীক্ষাই হোক। মেধা যাচাইয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেছে এই প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে। সেই সঙ্গে তদ্বির, দলবাজি, ঘুষ বাণিজ্য তো আছেই। তা হলে একজন সত্যিকারের যোগ্য প্রার্থী, যে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের পেছনে না ছুটে নিজের সব শক্তি, সব মেধা নিয়োজিত করল নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টায়, যে কোনো দল বা গোষ্ঠীর লেজুড়বৃত্তি করল না; যার কোনো মামা-চাচাও নেই, যোগ্যতা-দক্ষতা-মেধা থাকা সত্ত্বেও তার কী হবে? দিন শেষে একরাশ হতাশার অনলে পুড়ে অদৃষ্টকে দোষারোপ করা ছাড়া তার আর কীই বা করার আছে।

তিন.

প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় কিভাবে? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য কর্তৃপক্ষ কেবল শার্লক হোমস-কীরিটি রায়-স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড প্রভৃতির দ্বারস্থ হতে বাকি রেখেছেন। এ ছাড়া সমুদ্র মন্থন করতে কসুর করেননি। কখনো সন্দেহের অঙ্গুলি ছাপাখানার মুনি-ঋষি (ভূত নয়), কখনো পরম পূজনীয় গুরুমহাশয়দের দিকে উঠে যাচ্ছে। সেই সন্দেহের তালিকায় আমলা-কামলাদের নামও থাকছে। অতি উচ্চে মগডাল পর্যায়ে মিটিং-মাটিং হচ্ছে, কমিটি গঠিত হচ্ছে, দিস্তা দিস্তা রিপোর্ট জমা হচ্ছে, কিন্তু অপরাধী ধরা পড়ছে না। স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী, যিনি এক অর্থে দেশের শিক্ষকদের অভিভাবক, তিনি বলছেন শিক্ষকরা জড়িত, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) বলছে কর্মকর্তারা করছেন এই অপকর্ম, আর শিক্ষার্থীরা তো আছেই। প্রশ্ন হলো, এতই যখন আপনারা নিশ্চিত, তাহলে অপরাধীচক্রটি ধরা পড়ছে না কেন? অপরাধ তদন্তে মাঝে মাঝে একটা কথা শোনা যায় : অপরাধীকে আমরা আয়নার ভেতর দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ধরতে পারছি না। তাই তো, আয়নায় যে প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, তা যতই হুবহু হোক না কেন, তাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। সে রক্ত-মাংসের কায়া নয়, সে কায়াহীন ছায়া। তাহলে প্রশ্নপত্র ফাঁসে যারা জড়িত, তারাও কি তবে ছায়ামানব? নাকি কোনো অশুভ শক্তির আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে তারা থেকে যাচ্ছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে?

বাংলাদেশে এখন উন্নতমানের তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনেক দুর্ধর্ষ খুনের মামলার অপরাধীকেও ধরা সম্ভব হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে যেখানে কোনো নাম-নিশানা বা বিন্দুমাত্র ক্লু রেখে যায় না অপরাধী, সেখানেও পুলিশ, র‍্যাব ও গোয়েন্দা বিভাগ যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়ে অপরাধীকে পাকড়াও করছে, রহস্যের কূল-কিনারা করছে। (আবার সাপর-রুনি, তনু-মিতু-তৃকী হত্যার মত আপাতদৃষ্টিতে সহজ-সরল মামলার কূল-কিনারা না হওয়াটাও রহস্যজনক। এতে জনমনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়।) প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে তদন্তকারী সংস্থাগুলো আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করলে, সংশ্লিষ্ট সব মহল সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতার হাত বাড়ালে, এই অসাধু চক্রটিকে ধরা অসম্ভব নয় বলে আমরা মনে করি। পত্রিকান্তরে দেখলাম কমিশনারকে সাঙ্গপাঙ্গসহ র‍্যাব গ্রেপ্তার করেছে। জেনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর আমাদের বিশ্বাস ও আস্থা আরো দৃঢ় হয়েছে। তবে এরা যেভাবে ত্বরিত জামিন পেয়ে যায়, তা দেখে বিস্মিত হই বই কি।

এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জনগণের সহযোগিতা। আমার সন্তানকে যে করে হোক জিপিএ-৫ পেতে হবে কিংবা বিসিএস-এর চাকরি না পেলে জীবন বৃথা, এরূপ মানসিকতা পরিহার করতে হবে। ছেলে বা মেয়ে জিপিএ-৫ পেল কি পেল না সেটা বড় কথা নয়, সে সত্যিকারের মানুষ হলো কি না, যে জ্ঞানার্জনের জন্য তাকে বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছিল, তা কতটুকু অর্জিত হলো, সেটাই মুখ্য বিষয় হওয়া উচিত। সন্তানের জন্য প্রশ্নপত্র জোগাড়ের ধান্দায় না থেকে ছেলেটি বা মেয়েটি লেখাপড়া করছে কি না, তার চারিত্রিক বিকাশ ঘটছে কি না, সে কুসংসর্গে পড়ে বিপথে পা বাড়াচ্ছে কি না, সেসব ব্যাপারে মা-বাবার সজাগ দৃষ্টি থাকা উচিত। সন্তান প্রকৃত অর্থে মানুষ হলে সে হবে পরিবার ও দেশের সম্পদ। আর প্রশ্নপত্র হস্তগত করে জিপিএ-৫ পেলে সে হবে পরিবার, দেশ ও সমাজের জন্য এক বড় দায়। এই উপলব্ধিটা থাকতে হবে সব অভিভাবকের।

চার.

সেই সঙ্গে আগে এসএসসি-তে পাসের হার ছিল শতকরা ৫০, আর দেশবাসী দেখুন, এখন পাসের হার শতকরা ৯০, এটা আমাদের বিরাট অর্জন'—এ ধরনের মানসিকতা নিজের সঙ্গে নিজের প্রবঞ্চনার শামিল। যে শিক্ষাব্যবস্থায় এসএসসি-এইচএসসি-তে জিপিএ-৫-এর ছড়াছড়ির পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় শতকরা ১০ জনও টেকে না, তার গলদ কোথায় তা চিহ্নিত করতে না পারলে, তা জাতির জন্য মহা দুর্যোগ ডেকে আনবে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের যে মহামারী শুরু হয়েছে, তাতে ভবিষ্যতে কোনো সমাপনী বা নির্বাচনী পরীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন থাকবে বলে মনে হয় না। হয়ত লটারির মাধ্যমে পাস-ফেল, জিপিএ-৫, এ প্লাস, এ মাইনাস, চাকরি-বাকরি ইত্যাদি সব কিছু নির্ধারিত হবে এবং আমরা হয়ে যাব একটি লটারিনির্ভর জাতি।

মাঝে মাঝে খবর বেরোয়—ফাঁসকারী চক্রের লোকজন ধরা পড়েছে। যেমনটি ঘটেছে উপরোক্ত সরকারি কর্মকর্তার বেলায়। তারপর আর কিছু শোনা যায় না। এসব ক্ষেত্রে দ্রুত বিচার সম্পন্ন করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত। তবে বিষয়টির গভীরে যাওয়ার জন্য আরো বেশি করে কর্তৃপক্ষীয় উদ্যোগের প্রয়োজন। শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সবাইকে নিয়ে বৈঠক করে একটি সম্মিলিত প্রয়াস নিলে এবং সেই সঙ্গে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর তৎপরতা আরো বাড়ালে সাফল্য আসতে বাধ্য।

মোট কথা, যেনতেন প্রকারেণ তথাকথিত ভালো ফল পাওয়া ঝুড়ি ঝুড়ি মাকাল ফল দেশের কোনো কাজে আসবে না, বরং দেশকে ডোবাবে—এই বোধটা সবার ভেতর থাকা দরকার। আর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারটা যে অচিরেই জাতির গলায় ফাঁস হয়ে আটকে গিয়ে জাতিকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারবে, এটা মেনে নিয়ে বিষয়টি এখনই সর্বোচ্চ গুরুত্বসহকারে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা উচিত। তা না হলে পরে পস্তাবারও সময় পাওয়া যাবে না।

লেখক : সাবেক সচিব, কবি